দৈনিক সংবাদ
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ 21 OCT 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1
UU 182

নামগোত্রহীন শিক্ষাগুরুদের সমাচার দর্পণ

অনিরুদ্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচনে শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করে থাকেন। এই সিনেট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিনির্ধারক সংস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ সংশোধনের কথা উঠেছিল। তখন সরকারবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। অধ্যাদেশটি সংশোধনের প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা তাই স্বভাবতঃ উদ্বেগ বোধ করেন। অধ্যাদেশ অনুযায়ী মনোনীত ও নির্বাচিত মোট ১০৫ জন সদস্য নিয়ে সিনেট গঠিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত গ্রাজুয়েট সদস্যগণ এর মধ্যে ২৫জন সদস্য নির্বাচিত করে থাকেন। এরা ডাকযোগেই ভোট দিয়ে থাকেন সাধারণতঃ। এভাবে নির্বাচিত ২৫ জন সম্পর্কে কথা উঠেছে। এতে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের সুযোগ গ্রহণের সুবিধা থাকে। ভোটারদের প্রভাবিত করা বা ভুয়া ভোটের সুযোগের কথাই এখানে উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে একথাটা মনে রাখা ভাল যে, ছাত্র রাজনীতির মত শিক্ষক রাজনীতিও আছে। আর সেখানে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকবে এবং রয়েছেও। বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশে প্রদত্ত স্বায়ত্তশাসন সরকার যদি খর্ব করতে চান, তবে শিক্ষকদের মধ্যেও সরকার হাত বাড়াতে পারেন কিংবা সরকার সমর্থক শিক্ষকও থাকতে পারেন এবং রয়েছেন। স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষকদের মধ্যে মতভেদ থাকলে এর প্রস্তাবিত সংশোধন সম্ভব হতে পারে। শুধু গ্রাজুয়েট দ্বারা নির্বাচিত ২৫ জন সকলেই সরকার সমর্থক হবেন, এরকম আশঙ্কা শিক্ষকদের নিজেদের সম্পর্কে আস্থার অভাবও সূচিত করে। অর্থাৎ শিক্ষক রাজনীতির প্রশ্নটিই এখানে আসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসাবে যে-কোন সরকার থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রশ্নটি শিক্ষার স্বার্থেই শিক্ষকরা দেখবেন, এটাইতো শিক্ষকদের নিকট প্রত্যাশা। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও অধ্যাদেশে প্রদত্ত স্বায়ত্তশাসন যেন কোন অজুহাতে খর্ব না হয় এটাই চান। আর এই চাওয়া না চাওয়ার ভিত্তি হল শিক্ষা সম্পর্কে কী ধারণা তারা পোষণ করেন।

সুতরাং সিনেট নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। নীতিনির্ধারণকারী সংস্থা হিসাবে সিনেটের নির্বাচনে শিক্ষকরা চান তাদের দৃষ্টিভঙ্গির যথাযথ প্রতিফলন। শিক্ষকদের রাজনৈতিক মতাদর্শ এই নির্বাচন অনুষ্ঠানে উঠে আসে। শিক্ষার সামাজিক ভূমিকা এবং শিক্ষা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি রাজনীতি-বিবর্জিত নয়। এবারের সিনেট নির্বাচনে শিক্ষকরা সাদা, গোলাপী ও নীল--এই তিনটি গ্রুপে বিভক্ত হন। এখানে আমি নির্বাচনের ফলাফল কিংবা শিক্ষক রাজনীতিতে কে কোন্ আদর্শের ধারক এ নিয়ে আলোচনা করছি না।

সব নির্বাচনে যা হয়ে থাকে সিনেট নির্বাচনে তার ব্যতিক্রম হবে এমন আশা করা যায় না। তবু এটুকু আশা করা যায় সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে এবং প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ রাজনৈতিক দলের মত পরস্পরের চরিত্র হনন, কুৎসা ইত্যাদি না প্রচার করে নিজেদের মতাদর্শ, প্রতিদ্বন্দ্বী শিক্ষকদের সম্পর্কে মন্তব্য শালীন ভাষায় এবং প্রকাশ্যেই উচ্চারণ করবেন। যা সত্য তা খোলাখুলি বলে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালানো যেতে পারে।

আমাদের দেশে রাজনৈতিক নির্বাচনে হানাহানি, বোমাবাজি থেকে শুরু করে ভোটচুরি, জালভোট দেওয়ার রীতি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সাধারণ মানুষ নির্বাচনের ব্যাপারে এক সময় উৎসাহী হত এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসত। এখন তাদের আর কষ্ট করতে হয় না। ভোটকেন্দ্রে তারা না গেলেও ভোটের বাক্স ভরে যায়। বেদনার সঙ্গে আমরা এসব লক্ষ্য করি। প্রতিকারহীন এসব ঘটনা নিয়ে কিছুদিন আলোচনা ও মন্তব্য চলে। রাজনীতিকরা বিবৃতি দেন, নিন্দা করেন। তারপর একদিন উত্তেজনা থেমে যায়। এ ধরনের পরিস্থিতি নিয়ে দেশের চিন্তাশীল মানুষও আলোচনা করে থাকেন।

সিনেট নির্বাচন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কারা জিতল কারা হারল পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সিনেট নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে সাধারণ মানুষ ভাবে না। কারণ এখানে যারা নির্বাচিত হন, তারা দেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসেন না। যারা হেরে যান তারাও কোন আন্দোলনের কথা বলেন না।

কিন্তু দেশের শিক্ষিত সমাজ ও সচেতন মানুষ ঠিক ততটা উদাসীন মনোভাব নিয়ে সিনেট নির্বাচনকে দেখেন, এটা সত্য নয়। এ নিয়ে কোন প্রচার হয় না বা উত্তেজনা সৃষ্টি হয় না বলে সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়, এতে দেশের কিছু আসে যায় না। কিন্তু সত্যিই কী ব্যাপারটা তাই। আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যারা প্রতিনিয়ত নিজেদের মেধা, বুদ্ধি ও চিন্তাকে সতত সক্রিয় রাখেন শিক্ষক সম্প্রদায় তাদের অন্যতম গোষ্ঠী। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিনেট নির্বাচন সংক্রান্ত দুটো নামধামহীন প্রচারপত্র হাতে এসেছে। আগে থেকে একটু উদ্যোগী হলে আরও দু'একটা এধরনের প্রচারপত্রের খোঁজ পাওয়া যেত।

প্রচারপত্র দু'টি পড়ে ব্যথিত ও বিস্মিত হয়েছি। শঙ্কিত যে হইনি এমন কথা হলপ করে বলতে পারব না। কারণ, দেশে যখন নির্বাচন হয়, সেই নির্বাচনের ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, দেশ কোন্ পথে চলছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন নির্বাচনের ফলাফল দ্বারা প্রভাবিত হয়। সিনেট নির্বাচন দৃশ্যতঃ সে রকম কোন ছাপ সমাজে রাখে না। শিক্ষাঙ্গনে নিশ্চয়ই রাখে। তার খোঁজ আমাদের মত সাধারণ লোকে রাখে না। পার্থক্য এখানে।

প্রাপ্ত প্রচারপত্র দু'টিতে দু'জন শিক্ষক সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং তথ্য প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছে। শিক্ষকরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু তাদের ফেরেশতা মনে করি না। তাদের কিছু দুর্বলতা থাকতে পারে এবং থাকেও। সীমাবদ্ধতাও আছে। নির্বাচনের মুখে প্রতিপক্ষ নিশ্চয়ই তা মূলধন করবে। কিন্তু বেনামী প্রচারপত্র কেন? আর নিশ্চয়ই তা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থক শিক্ষক কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজেই লিখে বিলি করেছেন। এই প্রচারপত্র ছাত্রদের হাতেও পড়েছে। এই প্রচারপত্র পড়ে অভিযুক্ত শিক্ষক সম্পর্কে তারা অবহিত হয়েছেন তা না হলে তারা অন্ধকারে থাকতেন এমন কোন যুক্তি নেই। শিক্ষকরা পরস্পরের সবলতা দুর্বলতা জানেন। নির্বাচনে বেনামী প্রচারপত্র ছড়িয়ে অন্যের দুর্বলতা অপেক্ষা নিজেদের রুচিহীনতা তুলে ধরেছেন বরং। এই প্রচারপত্র যারা ছড়িয়েছেন সেই শিক্ষকদের রুচি, শিক্ষা, মানসিকতা সম্পর্কেও তো ছাত্ররা অবহিত হয়েছেন। এটা বোধহয় তারা খেয়াল করেননি। শিক্ষকদের মধ্যে যদি এ ধরনের লোক থাকে, তবে সেই শিক্ষকরা ছাত্রদের কী ধরনের শিক্ষা দিবেন। শিক্ষা চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। এই শিক্ষকরা তো চরিত্র গড়তে সাহায্য করা দূরে থাকুক, ছাত্রদের চরিত্র নষ্ট করার মত বিদ্যায় যে তারা পারদর্শী, সচেতন ছাত্রসমাজ এটাই ধরে নিবেন। এই প্রচারপত্রের ভাষা শুধু রুচিহীন নয়, বাক্য গঠনেও তাদের বিদ্যার বহর ধরা পড়ে। দুর্ভাগ্য যে, এ ধরনের বিদ্যাদিগ্গজগণ আমাদের শিক্ষাঙ্গনে মাত্র ডিগ্রীর জোরে অবস্থান করছেন। এই দু'টি প্রচারপত্রে দু'জন শিক্ষক সম্পর্কে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে, প্রচারপত্রটি লিখে তারাও তাদের অভিযোগ অনুযায়ী তাদের যে উক্ত দু'জন শিক্ষকের (যদি আনীত অভিযোগের মধ্যে সত্যতা থাকে) সমগোত্রীয় বলে প্রমাণ করেছেন।

আমার বক্তব্য এই নয় যে, কথিত শিক্ষক দু'জন সংক্রান্ত তথ্য সর্বৈব মিথ্যা বা মনগড়া। এর মধ্যে সত্য থাকতে পারে, হয়তো আছে। তবে সে কথাটা খোলাখুলি তারা বলতে পারতেন। নিজেদের নামধাম দিয়ে প্রচারপত্র লিখে তা অন্য শিক্ষকদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে পারতেন। আর তাদের এসব কার্যকলাপে (যদি সত্য হয়), তারা নিশ্চয়ই একদিনেই লিপ্ত হননি। তারাও বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরেই তারা এ ধরনের কার্যকলাপ চালিয়ে আসছেন। তাহলে প্রশ্ন উঠে, আপনারাই বা দীর্ঘদিন ধরে চুপ করে ছিলেন কেন। আপনাদের সততা ও সাহস এতদিন কোথায় ছিল। হ্যা, অনেকে অনুকূল পরিস্থিতিতে খুব সাহস দেখাতে পারেন। অনেক শিক্ষক '৭১ সালে সাহসের সাথে ইয়াহিয়া জান্তার আমলে বুক ফুলিয়ে চলেছেন; তারপর তাদের দুর্দিন এসেছিল। সে তো ক্ষণস্থায়ী। আমাদের বহু শিক্ষক পরবর্তী সময়ে দু'নৌকায় পা রেখে শ্রেণী ও সমাজ নিয়ে ভেবেছেন। কিন্তু অবস্থা বেগতিক দেখে যখন সরে দাঁড়াতে চেয়েছেন, তখন বেনামী হামলা থেকে রেহাই পাননি। ভিন্ন ধরনের চিত্রও আছে। কিন্তু প্রশ্ন সেখানে নয়। সিনেট নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা নিজেদের কথা বলবেন, প্রতিপক্ষের ত্রুটি ও দুর্বলতা তুলে ধরবেন এটা স্বাভাবিক। কিন্তু মেঘনাদের ভূমিকা কেন? আড়াল ঘুচিয়ে স্বনামে আত্মপ্রকাশ করলে দেশবাসী তাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে অবহিত হতে পারতেন। প্রচারপত্র রচয়িতাদের চেনাও সহজ হত। তবে কি ধরে নেব তারা আত্মপ্রচারে বিমুখ এবং পরনিন্দায় পঞ্চমুখ?

এ ধরনের প্রচারপত্র সিনেট নির্বাচন কতটা প্রভাবিত করেছে জানি না। তবে ছাত্রসমাজের ওপর এর কুপ্রভাব পড়তে বাধ্য। এ ধরনের শিক্ষকবৃন্দের সম্পর্কে তার একদা সহকর্মিগণ সচেতন ছিলেন না কেন, সে প্রশ্নও আসে। শ্রেণী ও সমাজের দোহাই দিয়ে এদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ওঠা-বসার পর নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছেন সে কি আদর্শ নীতি কিংবা অন্য কিছু সে প্রশ্ন তারা নিজেদের কাছে রাখতে পারেন। তাই বলছিলাম শিক্ষক রাজনীতির প্রশ্নটি ছাত্র রাজনীতির দলীয় চরিত্র ও আচরণ থেকে পৃথক নয়। ছাত্রদের মধ্যে যে ঐতিহ্যবোধ কাজ করে তার পূর্বসুরি শিক্ষকগণ। তাদের ধ্যান-ধারণার প্রভাব ছাত্রদের ওপর পড়ে। তবুও কথা থেকে যায়, আমাদের রাজনীতির মূল ধারায় রুচির একটা স্থান আছে। কিন্তু সেই রুচিকে যারা শ্রেণীর মানদণ্ডে বিচার করতে যেয়ে যে আবর্ত তারা সৃষ্টি করেছিলেন তাতে তাদের অহংবোধ যতটা প্রবল ছিল, শিক্ষার মর্যাদা সেই পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। আজ নিজেদের পৃথক অবস্থানের ওপর তাদের রুচিহীন প্রত্যাঘাত ব্যক্তিগত ক্ষতি অপেক্ষা যে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে সেটাই আশঙ্কার কারণ। কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিপ্লবের ও সমাজ পরিবর্তনের বুলি এখন আর নতুন নয়। সুতরাং ভরসাটা বিপ্লবের ওপর নয়, ভরসা রাখি রুচিবোধের ওপর। সেই রুচির দুর্ভিক্ষের চিত্র দু'টি প্রচারপত্রে বাচনিক চেহারায় এমনভাবে ফুটে উঠেছে, তাতে বিস্মিত হতে হয়। পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরা হাস্যাস্পদ হয়, কিন্তু শিক্ষিতম্মন্য ব্যক্তিরা সমাজের আত্মাকে আঘাত করে। জাতীয় চরিত্রে ঘুণ ধরিয়ে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর আঘাত আসে প্রথমে ভিতর থেকে, বাইরের আঘাত উপলক্ষ হয়ে দেখা দেয়। এবার সিনেট নির্বাচনে আলোচ্য ধরনের প্রচারপত্রটি কৌশলে স্বায়ত্তশাসনের চরিত্রকে ব্যভিচারী বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ উপলক্ষ মাত্র।